নাফিস ও লিন্ডার গল্প

হারুন ইবনে শাহাদাত

নাফিস ও লিন্ডার গল্প

হারুন ইবনে শাহাদাত

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
ঢাকা, চট্টগ্রাম

www.pathagar.com

নাফিস ও লিন্ডার গল্প

হারুন ইবনে শাহাদাত

প্রকাশক
এস,এম, রইসউদ্দীন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোনঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোনঃ ৯৫৬৯২০১

প্রকাশকাল
একুশে বই মেলা ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০,
ফোন ঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

অংকন
খলিল রহমান

ডিজাইন
ডিজাইন বাজার
৪৮ এবি পুরানা পল্টন, বাইতুল খায়ের টাওয়ার, ঢাকা-১০০০, ফোন-৭১৭১৯৭৫

মূল্য ঃ ১১০.০০ টাকা মাত্র

পাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫২, গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর,ঢাকা
৩৮/৪, মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা

NAFIZ O LINDER GALPO (A story of Nafiz & Linda), Written by Harun Ibn Shahadat, Published by S.M. Rais Uddin, Director (Publication)
Bangladesh Co-operative Book Society Limited, 125 Motijheel C/A, Dhaka.
Price: TK. 110.00, US$. 3.00

ISBN- 984-493-107-X

www.pathagar.com

উৎসর্গ

মানবতা বিধ্বংসী যুদ্ধে
মা-বাবা হারা অগণিত অসহায়
শিশুদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

হারুন ইবনে শাহাদাত একজন সাংবাদিক এবং কথাসাহিত্যিক। তাঁর লেখা প্রকাশিত প্রথম বই 'জ্বলছে চেচনিয়া' মুসলিম বিশ্বের একটি সমস্যার বিশ্লেষণ নিয়ে। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ একটি মননশীল উপন্যাস 'তারপরও ভালবাসি'। লেখক প্রায় এক যুগ ধরে একটি জাতীয় পত্রিকার শিশু-কিশোর পাতা সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন। তার এই অভিজ্ঞতাই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে শিশু-কিশোরদের জন্য কলম ধরতে। 'নাফিস ও লিন্ডার গল্প' হারুন ইবনে শাহাদাতের শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। এ ক্ষেত্রে তিনি দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ঘরে বসে বহুদূর'-এ।

তিনি শুধু গল্পের জন্য গল্প লিখেন না। তার প্রতিটি গল্পের মধ্যে লুকিয়ে আছে চরিত্র গঠন, মননের বিকাশ ও নৈতিক শক্তি অর্জনের উপাদান। শিশু-কিশোররা সরাসরি উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। কিন্তু কোন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে কী ভাল কী মন্দ তা তুলে ধরতে পারলে তা তাদের কোমল মনে গভীর রেখাপাত করে। একগুচ্ছ গল্পে সমৃদ্ধ বইটির প্রতিটি কাহিনী তৈরিতেই লেখক তার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন।

'নাফিস ও লিন্ডার গল্প' শিরোনামের গল্পটিতে চিত্রিত হয়েছে যুদ্ধের ভয়াবহতা। নাফিস যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরাকের এক অসহায় শিশু, যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার মনে তীব্র ঘৃণা। কিন্তু শিশুদের জন্য তার মনে ভালবাসার কোন কমতি নেই। 'রাজপুত্রের বিদায়' গল্পে দুষ্টুমি কি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে রাসেলের জীবন প্রবাহে সেই ছবি নিখুঁদভাবে উঠে এসেছে। কোন উপদেশ নয়, ঝর ঝরে ঘটনার বর্ণনা। কিন্তু কিশোর মনে এর প্রভাব তাদেরকে দুষ্টুমি থেকে বিরত রাখবে। 'হারাবিল' গল্পে লেখক এমন এক রহস্যের সৃষ্টি করেছেন, যা ভেদ করতে পারলে ক্ষুদে পাঠকরা বুঝতে পারবে, আসলে ভূত বলে কিছু নেই। 'একটি সুন্দর স্বপ্ন' গল্পে রয়েছে সুন্দর জীবন গড়ার প্রেরণা।

আমার বিশ্বাস এ বইয়ের গল্পগুলো শুধু ক্ষুদে পাঠকদেরকেই উজ্জীবিত করবে না, তাদের মা-বাবা অভিভাবকদেরকেও শিশু-কিশোর মনের অজানা রহস্য উন্মোচনে সাহায্য করবে। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ নাফিস ও লিন্ডার গল্প প্রকাশ করে শিশু-কিশোরদের নিকট পৌঁছে তাদের মনে মুকুলকে প্রস্ফুটিত করার জন্য দৃঢ় আশাবাদী।

(এস,এম, রইসউদ্দীন)
পরিচালক প্রকাশনা
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

লেখকের কথা

শিশু-কিশোররা জাতির ভবিষ্যৎ। তারাই একদিন দেশ ও জাতির নেতৃত্ব দিবে। তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর জন্য প্রয়োজন ইতিবাচক ও মননশীল সাহিত্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ছোট্ট সোনামণিদের জন্য আমার এ প্রয়াস।

আমার এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে "নাফিস ও লিভার গল্প" বইটি মলাটবদ্ধ করতে যারা উৎসাহ এবং মেধা ও মনন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির পরিচালক ইনচার্জ, ঢাকা (প্রকাশক) জনাব এস. এম. রইস উদ্দীন, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সাইফুল্লাহ মানছুর, কবি আসাদ বিন হাফিজ, বন্ধু কবি ওমর বিশ্বাস, মোঃ গাউসুল্লাহ, মোঃ তোফাজ্জল হোসাইন, স্নেহের গোলাম রব্বানী খান, শিল্পী খলিল রহমান, ডিজাইন বাজারের নাসির উদ্দিন ও আমিনুল ইসলাম মাসুদের আন্তরিকতা কোনদিন ভুলব না।

মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, কারও চোখে কোন ভুল ধরা পড়লে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করব ইনশাল্লাহ ।

১ ফেব্রুয়ারি '০৮

হারুন ইবনে শাহাদাত
৪১, গ্রীনওয়ে, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

সূচিপত্র

নাফিস ও লিন্ডার গল্প ০৭
প্রজাপতির গন্ধ ১০
মজার খেলা ১৩
মুকুলের ভালবাসা ১৬
মায়ের হাসি ১৯
বসির আবার স্কুলে যাবে ২৩
রাজ পুত্রের বিদায় ২৬
আসিফের শাপলাবাড়ি অভিযান ২৯
আকাশ ছোঁয়ার গল্প ৩১
হারাবিল ৩৪
একটি সুন্দর স্বপ্ন ৩৭

www.pathagar.com

নাফিস ও লিন্ডার গল্প

দুপুর বারটা। নাফিস সাবরী হাফিতী ইরাকের রাজধানী বাগদাদের রাজপথ ধরে হাঁটছে। সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এক ফোঁটা পানিও তার পেটে পড়েনি। ছোট পেটটায় আগুন জ্বলছে, ক্ষুধার জ্বালায় মাথা ঘুরছে। কিন্তু কে তাকে খাবার দিবে? নাফিস কার কাছে যাবে? না, সে আর পারছে না। তার পা অবশ হয়ে আসছে। নাফিস আর হাঁটতে পারছে না, রাস্তার পাশে বসে পড়ে। কয়েকজন আমেরিকান সৈনিক রাস্তায় টহল দিচ্ছে। সৈন্যদের দেখে ওর মনে আশা জাগে। আমেরিকানদের নাফিস মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। কিন্তু তারপরও ওদের দেখে মনে আশা জাগে। সৈনিকরা ওদের খাবারের উচ্ছিষ্ট রাস্তার পাশে ফেলে। তৃপ্তির সাথে নাফিস তাই মাঝে মাঝে খায়। এভাবেই ওর দিন চলে যায়। খাবারের লোভে নাফিস সুযোগ পেলেই আমেরিকান সৈনিকদের সাঁজোয়া যান ও ট্যাংক বহরের কাছে চলে আসে। টহল দেয়ার সময় সৈনিকরা বিস্কুট, কেক এবং আপেল, কমলার জুস খায়।

www.pathagar.com

টহলরত সৈন্য দল ওর কাছাকাছি চলে এসেছে। ওদের দু'জনের হাতে জুসের ক্যান। ঢকঢক করে খাচ্ছে। নাফিসের চোখে মুখে খুশীর ঝিলিক দেখা যায়। সে উঠে দাঁড়ায়। ওর দিকে একজন সৈনিক রাইফেল তাক করে। সে দুই হাত উপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর কাছাকাছি এসে সৈনিকরা ক্যান দু'টি ফেলে দেয়। তারপর তারা সামনে হাঁটতে থাকে। নাফিস খরগোশের মত দ্রুতগতিতে দৌড়ে ক্যান দু'টি হাতে তুলে তাতে মুখ লাগায়। এক ফোঁটা কমলার রস টুপ করে মুখে পড়ে। তারপর খুব ঝাকাঝাকি করে, কিন্তু না আর নেই। তারপরও সে ক্যানটি ফেলে দেয় না। দ্বিতীয় ক্যানটিতে মুখে লাগায়, না কিছু নেই। নাফিস বসে ক্যান দু'টি পাগলের মতো চাটতে থাকে। তারপর স্থির হয়ে বসে। তার চোখে ভেসে ওঠে ফেলে আসা দিনের কিছু ছবি।

নাফিসের আব্বু সুলতান হাতিফি ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি সাদ্দাম সরকারের অধীনে চাকরি করতেন। বাগদাদের একটি সরকারি কলোনীতে থাকতো ওরা। নাফিসের আব্বু-আম্মু আর ছোট বোন রায়নাকে নিয়ে ছিল ওদের সুখের সংসার। প্রতিদিন সকালে রুটি মাখন আর ফলের জুস দিয়ে নাস্তা করে আব্বুর গাড়িতে স্কুলে যেত নাফিস। রায়না ছিল ওর চেয়ে দু'বছরের ছোট। ওর বয়স ছিল চার। সে স্কুলে যেত না। বাসায় মায়ের কাছে পড়ত। আগামী জানুয়ারিতে ওকে স্কুলে ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন আব্বু। আজ সব কিছু স্বপ্নের মত মনে হয় নাফিসের কাছে। প্রতিটি সকালের মত সেদিনও সে স্কুলে গিয়েছে। আব্বু ওকে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে বাসায় আসেন অফিসে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে। তারপর শুরু হয় বুশ বাহিনীর বিমান হামলা। বোমার আঘাতে আগুন ধরে যায় ওদের বাসায়। গোটা কলোনী পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। স্কুল থেকে বাসায় ফিরে সে কাউকে পায়নি। আবার কাঁদতে কাঁদতে স্কুলে চলে যায়। হেডমিসট্রেস আপু ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করেন। তার বাসায় নিয়ে যান। পরদিন খবর আসে আমেরিকান সৈন্যরা স্কুলে বোমা ফেলছে। খবর শুনে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে বের হয় যান হেডমিসট্রেস আপু। তারপর তিনিও আর ফিরে আসেননি। নাফিস রাস্তায় নেমে আসে। আহমদ, উসমান, তাকীসহ আট/দশজন বন্ধুও জোটে ওর। সবাই ওর মত বাবা-মা ও স্বজনহারা। সারাদিন ঘুরে বেড়ানো, হাত পেতে, কুড়িয়ে কখনো কখনো চুরি করে খাবার সংগ্রহ করে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে ওরা। রাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া কোন বাড়ীতে, স্টেশনে ঘুমিয়ে আগামী দিনের সুন্দর সকালের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু না, যতদিন বুশ আছে,

www.pathagar.com

আমেরিকা আছে, ততদিন ওদের শান্তি নেই। নাফিসের বন্ধুদের অনেকেই হারিয়ে গেছে আমেরিকান সৈনিকদের বোমা ও বুলেটের আঘাতে।

কর্নেল মার্টিনের মনটা আজ খুশীতে ভরে উঠেছে। তার স্ত্রী লিসা মা হয়েছেন। তিনি হয়েছেন বাবা। এই তো কিছুক্ষণ আগে স্যাটেলাইট ফোনে কথা হলো তার স্ত্রীর সাথে। তার কোলে ছিল তাদের প্রথম কন্যা সন্তান লিন্ডা। লিন্ডার কান্নার শব্দও মার্টিন ফোনে শুনেছে। তার ইচ্ছে করছে এখনই উড়ে গিয়ে সন্তানকে কোলে তুলে নিতে। কিন্তু উপায় নেই। বুশ প্রশাসন ওদের ছুটি বাতিল করেছে। মার্টিন মনে মনে ভাবছে, বুশ মানে আবর্জনা। এই আবর্জনাটা কবে দূর হবে? কবে তিনি লিন্ডাকে কোলে তুলে নিতে পারবেন?

নাফিস খালি জুসের ক্যানগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। টহল সৈন্য দলটি আবার এদিকে আসছে। দলের নেতৃত্বে রয়েছেন কর্নেল মার্টিন। তিনি নাফিসের কাছে এসে দাঁড়ান। ক্ষুধার্ত এই ছোট ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে তার সন্তানের কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বুঝতে পারেন, ছেলেটি ক্ষুধায় কাতরাচ্ছে। তিনি নাফিসকে কাছে ডাকেন। ভয়ে নাফিস কাঁপতে থাকে। তিনি তাকে অভয় দেন। তারপর হাতে তুলে দেন এক প্যাকেট বিস্কুট আর এক ক্যান জুস। দৃশ্যটি লুফে নেয় আমেরিকান টিভি চ্যানেল সিএনএনের ক্যামেরা। বিশ্ববাসীর কাছে একজন পিতার ভালবাসাকে তুলে ধরে আমেরিকান নোংরা রাজনীতির মোড়কে।

কয়েকদিন পরের কথা। গ্রীন জোনের দিকে ছুটে চলছে একটি সাঁজোয়া যান। পিছন দিক থেকে আঘাত করলো একটি পাজেরো জিপ। বিকট শব্দে বিস্ফোরিত বোমার আঘাতে মুহূর্তে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো গোটা এলাকা। শব্দ শুনে দৌড়ে সেদিকে ছুটে আসে নাফিস। যদি খাবার উপযোগী কিছু পাওয়া যায়। সে চমকে ওঠে! কয়েকদিন আগে যে আমেরিকান সৈন্যটি তাকে বিস্কুট আর জুস দিয়েছিলেন, মৃত সৈনিকদের মাঝে পড়ে আছে তার ক্ষতবিক্ষত লাশ। সে মৃত সৈনিকের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়। না বিস্কুট নেই, জুসও নেই। বের হয়ে আসে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়ে শিশুর ছবি। ছবিটির নীচে ইংরেজিতে লেখা লিন্ডা। আমেরিকান সৈনিকরা আসছে, আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা নিরাপদ নয়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে শুরু করবে বর্বর অত্যাচার। যাকে সামনে পাবে, বাছ-বিচার না করে ধরে নিয়ে যাবে আবুগারিব কারাগারে। ছোট বলে ছেড়ে দেবে না নাফিসকেও। লিন্ডার ছবিটা বুকে নিয়ে নাফিস প্রাণপণে দৌড়াতে থাকে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ...

www.pathagar.com

প্রজাপতির গন্ধ

আব্বু! আব্বু! প্রজাপতিটা ওড়ে না, দেখ। দেখ, কেমন করে পড়ে আছে? বারান্দা থেকে ডাকছে ফারিয়া। হাসান সাহেব ড্রয়িং রুমে টেলিভিশনের সামনে বসা। তিনি সকালের খবর দেখছিলেন। কিন্তু উপায় নেই। ফারিয়ার ডাক শুনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে উঠতে হলো।

কি হয়েছে মামণি, দেখি দেখি? ফারিয়ার ডাকে সাড়া দিতে দিতে তিনি বারান্দার দিকে পা বাড়ালেন। হাসান সাহেব সৌখিন মানুষ। ড্রয়িং রুমের পাশের বারান্দায় বেশ কিছু টবে ফুলের গাছ লাগিয়েছেন। বারান্দাটাকে মিনি ফুল বাগান বললে ভুল হবে না।

www.pathagar.com

তার একমাত্র সন্তান ফারিয়া। বয়স চার বছর। সে প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় যায়। ফুল গাছগুলো দেখে। কোন্ গাছে কবে কয়টা ফুল ফুটলো সব খবর রাখে। রোদ ওঠার সাথে সাথে ফুল গাছগুলো যখন সজাগ হয়ে ওঠে, তখন সে গাছের সাথে কথা বলে। এই যে গোলাপ ফুলের মা, তুমি কি সারারাত ঘুমিয়েছিলে? রোদ পেয়ে এখন জেগে উঠলে, তাই না? আমিও সারারাত ঘুমিয়ে থাকি, তুমি জান। আমি মামণির বুকে ঘুমাই। তুমি তো আবার গোলাপ গাছ, মানে গোলাপ ফুলের মা। তোমার কোলে ঘুমায় গোলাপ ফুল, তাই না ... বলে ফিক করে হেসে উঠে ফারিয়া।

প্রতিদিন সকালে এই ছোট্ট ফুল বাগানে দু'টি পাখি আসে। পাখি দু'টি কিচির-মিচির ডাকে। পাখির কিচির-মিচির শুনে প্রথমে পিট পিট করে তাকায় ফারিয়া। তারপর উঠে সোজা বাগানে চলে যায়। ওকে দেখে পাখি দু'টি পাখা মেলে উড়ে চলে যায়। ফারিয়া হেসে হেসে বলে, ও আমার ঘুম ভাঙাতে এসেছিলে। তোমরা না ডাকলে তো আমার ঘুমই ভাঙে না। ডেকে ডেকে আমার ঘুম ভাঙিয়ে তোমরা চলে যাও কেন? ফারিয়ার প্রতিটি সকালের রুটিনের খুব একটা ব্যতিক্রম হয় না। ওর মা ওকে বারান্দা থেকে এনে, ব্রাশ করিয়ে নাস্তা করান। কিন্তু আজ মা বারান্দায় যাওয়ার আগেই ফারিয়া তার বাবাকে ডাকছে। সাধারণত সে এমন করে না। হাসান সাহেব বারান্দায় গিয়ে দেখেন একটা প্রজাপতি হাতে নিয়ে ফারিয়া তাকে ডাকছে, দেখ আব্বু দেখ। প্রজাপতিটা ওড়ে না। হাসান সাহেব বলেন, দেখি মামণি।

এই যে দেখ। ফারিয়া প্রজাপতিটা তার বাবার হাতে দেয়। হাসান সাহেব হাতে নিয়ে দেখেন প্রজাপতিটি মারা গেছে। রাতে বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে ভিজে মারা গেছে প্রজাপতিটি। তার মন খারাপ হয়ে যায়। তিনি এক হাতে প্রজাপতিটি ধরে, ফারিয়াকে কোলে করে ড্রয়িং রুমে চলে আসেন। টিভিতে তখনও খবর হচ্ছে। টিভির পর্দায় দেখা যাচ্ছে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত আজাদ কাশ্মীরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মা-বাবা হারা শিশুদের। ভূমিকম্পের তাণ্ডবে ঐ শিশুদের স্বজনরা কেউ বেঁচে নেই। প্রতিবেদক ভারাক্রান্ত কণ্ঠে ওদের দুঃসহ কাহিনী তুলে ধরছেন, হাসপাতাল থেকে ফিরে ওরা কোথায় যাবে ..

হাসান সাহেবের চোখে পানি আসে। স্বজনহারা শিশুদের মাঝে তিনি দেখতে পান তার কোলে বসা ফারিয়ার মুখ। ফারিয়া প্রশ্ন করে, আব্বু প্রজাপতিটা কি

www.pathagar.com

আর ওড়বে না। হাসান সাহেব বলেন, না মামণি এটা গত রাতের বৃষ্টিতে ভিজে মারা গেছে। ফারিয়ার মন খারাপ হয়ে যায়। সে সুফিয়াকে ডাকে, এই সুফিয়া আপু শোন, প্রজাপতিটা মরে গেছে। মরা প্রজাপতি উড়তে পারে না।

সুফিয়া হাসান সাহেবের বাসায় কাজ করে। ওর বয়স দশ-বার বছর। মা রংপুরের কোন এক গ্রামে থাকে। বাবা নেই। ওর এক দূরসম্পর্কের চাচা ওকে হাসান সাহেবের বাসায় দিয়েছেন কাজ করার জন্য। সকালে ঘুম থেকে উঠে সে কিচেনে কাজ করছিল। ফারিয়ার ডাক শুনে ড্রয়িংরুমে আসে। ফারিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলে, কি হয়েছে আপু। ফারিয়া ওর ছোট। তারপরও সে তাকে আপু বলে ডাকে। ফারিয়া হাসান সাহেবের হাতের প্রজাপতিটির দিকে আঙ্গুল তুলে সুফিয়াকে দেখায়, দেখ দেখ প্রজাপতিটি মরে গেছে।

সুফিয়া তেমন উৎসাহ দেখায় না, কাজ ফেলে এসেছে, গিন্নি মা দেখলে রাগ করবেন। সে শুধু বলে, তাই।

হাসান সাহেব মন থেকে আজাদ কাশ্মীরের মা-বাবা হারা শিশুদের সুন্দর মুখের ছবি কিছুতেই মুছতে পারছেন না। সুফিয়াকে দেখে তার ভাবনায় ছেদ পড়ে। তিনি ভাবেন এই মেয়েটিও তো এতিম। ওকে নিয়ে তো কোনদিন এমন ভাবনা তার মনে আসেনি। ওর কি হবে? ওকে কে লেখাপড়া করাবে? কিভাবে সে মানুষ হবে?

টেলিভিশনের খবর শেষ হয়ে গেছে। অন্য একটি অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ঘোষক এ পৃথিবীকে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য নিরাপদ রাখতে প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব বুঝাচ্ছেন। ফারিয়া হাসান সাহেবের কোল থেকে নেমে প্রজাপতিটা তার হাতে থেকে নিয়ে নেয়। তারপর সুফিয়াকে বলে, এই নাও মরা প্রজাপতি। ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দাও। তা না হলে গন্ধ ছড়াবে। হাসান সাহেব সুফিয়ার দিকে একবার আরেকবার ফারিয়ার দিকে তাকিয়ে ভাবেন, মানুষ করতে না পারলে ওরাও একদিন পচে গন্ধ ছড়াবে। কিন্তু ফারিয়ার সাথে সুফিয়াকেও তিনি কি মানুষ করতে পারবেন? এমন সময় রান্না ঘরে থেকে ভেসে আসে হাসান সাহেবের স্ত্রীর চিৎকার। এই সুফিয়া কই গেলি ...

www.pathagar.com

মজার খেলা

নূরু মনে মনে পণ করেছে সে আজ বাড়ি ফিরবে না। বাড়ি ফেরা মানে মায়ের হাতের কঞ্চির বাড়ি খাওয়া। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নূরুর মা তাকে পড়াতে বসান। তখন আর মাকে মা বলে মনে হয় না। মনে হয় পুলিশের চেয়েও ভয়ঙ্কর কিছু একটা। তার হাতের কঞ্চিটার দিকে তাকালে নূরুর ছোট বুকটা শুকিয়ে যায়। অ-তে অজগর ঐ আসছে তেড়ে, আ-তে আমটি আমি খাব পেড়ে ... নূরু মায়ের সাথে সাথে জোরে জোরে পড়ে। যতক্ষণ মাথা নিচু করে থাকে ততক্ষণ তার পড়া ভুল হয় না। কিন্তু মায়ের ধমকে মাথা তুলে তার হাতের কঞ্চির দিকে তাকালেই সব ভুলে যায়। মনে হয় ঐ কঞ্চিটাই বুঝি অজগর। স্কুলে সে কিছু কিছু পড়া পারে। কিন্তু বাড়িতে মায়ের সামনে বসে স্কুলের পড়া তৈরি করতে পারে না। তাই স্কুলে সে খুব একটা ভাল করতে পারছে না। মায়ের কানে যেদিন খবর আসে সে স্কুলে পড়া পারেনি, সেদিন আরও কয়েক ঘা কঞ্চির বাড়ি বেশি পড়ে তার পিঠে।

www.pathagar.com

নূরুর বয়স পাঁচ বছর। এক বছর যাবৎ সে স্কুলে যাচ্ছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বর্ণগুলোর সাথেও তার পরিচয় হয়নি। মাঝে মাঝেই সে গুলিয়ে ফেলে। তাই নূরু পণ করেছে আজ সন্ধ্যায় সে বাড়ি ফিরবে না। নদীর ধারে এই ঝোপের আড়ালে বসে রাত কাটাবে।

নূরুদের গ্রামের নাম জামতৈল। ছোট্ট সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট একটি নদী। নদীর নাম ঝিনাই। সে প্রতিদিন বিকেলে নদীর পাড়ে আসতে চায়। কিন্তু তার এদিকে আসা বারণ। ছোট্ট মানুষ নদীতে পড়ে গেলে ডুবে মরবে- এই ভয়ে তাকে একা কেউ নদীর পাড়ে আসতে দেয় না। আজ সে সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে এখানে এসেছে। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সূর্যটা লাল হতে হতে একটা বড় থালার মত হয়ে গেল। নদীর পানিতে ডুবন্ত সূর্যের আবির রঙ লেগে এক অপরূপ বর্ণ ধারণ করলো। দূরে গাঁয়ের ফাঁকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে সূর্য। এমন সুন্দর অপরূপ পরিবেশ নূরুর খুব ভাল লাগছে। বাড়ি, মা-বাবা, দাদা-দাদী, চাচা-চাচী, স্কুল, শিক্ষক কোন কিছুই এখন তার মনের মাঝে নেই। সে সন্ধ্যার এই অপরূপ প্রকৃতির সাথে মিশে গেছে।

সূর্য ডুবে গেল। চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। ঝোপের ভিতর লুকিয়ে থাকা ঝিঁ ঝি পোকাগুলো ঝিঁ ঝি ডাকের কোরাস তুলেছে। ভয়ে নূরুর গলা শুকিয়ে আসছে। সে আস্তে আস্তে ঝোপের আড়াল থেকে বাইরে আসে। দূরে শিয়ালের ডাক শোনা যায়। ভয়ে নূরু কেঁদে ফেলে।

নূরু! নূরু! নূরু! ডাকতে ডাকতে হারিকেন হাতে কারা যেন এদিকে আসছে। নূরু কি করবে? কিছু ভেবে পায় না। ঝোপে লুকাতেও সাহস পাচ্ছে না। ডাক শুনে সে বুঝতে পারে নিশ্চয়ই কেউ তাকে খুঁজতে বের হয়েছে। তাদের হাতে ধরা দেয়া মানে নির্ঘাত মায়ের হাতে মার খাওয়া। রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যেতে আবার শিয়ালের ভয়। আস্তে আস্তে হারিকেনের আলো স্পষ্ট হতে থাকে। নূরু দেখতে পায় তার বাবা, চাচা আর নাবিল এদিকেই আসছে। তার চাপা কান্না বিপুল বেগ পায়। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে। নাবিল চিৎকার করে বলে, চাচু ঐ তো নূরু, নূরু কাঁদছে।

নূরুর ছোট চাচা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে, এখানে তুমি কি করছিলে? নূরু কোন কথা বলে না। ছোট চাচার বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে। নাবিল পাল্টা প্রশ্ন করে, কি নূরু? তুই কোথায় ছিলি? আমি, মামণি ঢাকা থেকে এসেই তোর খোঁজ করছিলাম কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না। সন্ধ্যার পর তো চাচী কান্নাকাটি শুরু করেছে। চাচারা বের

www.pathagar.com

হয়েছে তোকে খুঁজতে। সাথে আমিও এলাম।

নাবিল নূরুর বড় চাচার ছেলে। ওরা ঢাকায় থাকে, নাবিলের বাবা ঢাকায় বড় চাকরি করেন। ওর মা একটা স্কুলে শিক্ষকতা করেন। আজ দুপুরের পর ওরা ঢাকা থেকে এসেছে।

সবাই নূরুকে নিয়ে বাড়ি ফিরে। ওর মা ওকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকেন। বড় চাচী মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে জানতে চায়, এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে বাবা? নূরু কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি লেখাপড়া করব না। কিছুই পারি না। শুধু শুধু প্রতিদিন পড়তে বসে মায়ের হাতে মার খাই। নূরুর বড় চাচী বিষয়টি বুঝতে পারেন। ওকে কাছে ডেকে বলেন, ঠিক আছে। এ বিষয়ে তোমার সাথে কাল সকালে কথা বলব। এখন খাবে চল।

পরদিন সকালে চাচী নাবিলকে বলেন, নূরুকে ডেকে নিয়ে আয়। নাবিল নূরুকে ডেকে আনে। চাচী খাতা কলম হাতে নিয়ে বলেন, নূরু আমরা তিনজনে মিলে এখন একটা খেলা খেলব।

নূরু চোখ বড় বড় করে তাকায়। সে ভাবতে থাকে খাতা কলম নিয়ে আবার কি খেলা খেলবেন চাচী। চাচী নূরুর হাতে একটি খাতা ও পেন্সিল এবং নাবিলের হাতে একটি খাতা পেন্সিল দেন। তারপর বলেন, এ খেলার নাম শব্দ বানানো খেলা। প্রতি শব্দের জন্য এক পয়েন্ট। যে যত বেশী শব্দ বানাতে পারবে, সেই বিজয়ী। প্রথমে নাবিল 'ক' দিয়ে একটি শব্দ বানাও তো? নাবিল খাতায় লেখে কলা।

চাচী নূরুকে বলেন, তুমি আ- দিয়ে একটি শব্দ বানাও তো। নূরু হাসতে হাসতে বলে আ-ম আম।

চাচী হেসে বলেন, নাবিল পেল এক পয়েন্ট তুমিও পেলে এক পয়েন্ট।

এবার নাবিল জানালা দিয়ে বাইরে দেখ। কি দেখা যায়?

নাবিল বলে, দাদাকে দেখা যাচ্ছে।

নাবিলের মা বলেন, দাদা লিখতে কি লাগে? নাবিল এবং নূরু এক সাথে বলে ওঠে দা-দা দাদা।

বড় চাচী এবার নূরুর কাছে জানতে চায়, খেলাটা খুব মজার তাই না বাবা নূরু মুচকি হেসে বলে, খুব মজা। চাচী আমি লেখাপড়া ছাড়বো না।

www.pathagar.com

মুকুলের ভালবাসা

মুকুলের মাথা ঘুরছে। সে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। অনুশোচনার আগুনে তার অন্তর জ্বলছে। সে কি করে এত বড় ভুল করল, ভাবতে গিয়ে তার দু'চোখে বান ডাকে। মুকুলের বয়স বার বছর। সে এবার ক্লাস সিক্সে ভর্তি হবে। ক্লাস ফাইভের বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে। পরীক্ষার আগে ওর মা ওকে উৎসাহিত করার জন্য বলেছিলেন, 'মুকুল তুমি যদি ক্লাস ফাইভের ফাইনাল পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারো, তাহলে তোমাকে একটা দামী উপহার দিব'। মায়ের কথায় দ্বিগুণ উৎসাহে মুকুল পড়ালেখা করছে। সে মনে মনে ঠিক করেছে মায়ের কাছ থেকে উপহার হিসেবে সে একটা মোবাইল ফোন চেয়ে নিবে। বন্ধুদের অনেকেরই মোবাইল আছে। ওরও শখ একটা মোবাইল ফোনের।

মুকুলের মা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন মুকুলের জন্মের পর পরই হারিয়ে গেছেন ওর বাবা। তারপর হতে মুকুলই তার পৃথিবী। তাকে নিয়েই তার স্বপ্ন, ওকে আঁকড়ে ধরেই তিনি আগামীর স্বপ্ন দেখেন। এর বাইরে তিনি আর কিছু ভাবেন না। একই সাথে বাবার আদর আর মায়ের স্নেহে লালন-পালন করছেন তিনি মুকুলকে। এই ছোট মুকুলের পৃথিবীও তার মা। সে তার মাকে মাঝে মাঝে বলে, 'মা তোমার এই মুকুল চিরদিন মুকুল থাকবে না। দেখে নিও আল্লাহর রহমতে একদিন অবশ্যই ফুল হয়ে ফুটবে। সেদিন আর তোমার কোন

www.pathagar.com

দুঃখ থাকবে না।' মুকুল মায়ের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্নে বিভোর। তাই সে কখনও মায়ের কথার অবাধ্য হয় না। মন দিয়ে লেখাপড়া করে। খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে না।

ক্লাস ফাইভের বার্ষিক পরীক্ষার রেজাল্ট বের হওয়ার পরদিন মা ওর হাতে একটা সুন্দর প্যাকেট তুলে দিয়ে বলেন, 'বাবা, এই নাও তোমার উপহার'। মুকুল হাসিমুখে প্যাকেটটি হাতে তুলে নিয়ে বলে, মা পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছি। তুমি বলেছিলে আমাকে একটি দামী উপহার দিবে, সেটি কই?

মা পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'এই প্যাকেটে যা আছে, তা কি দামী নয় বাবা। দোকানের সবচেয়ে দামী শার্ট-প্যান্ট তোমার জন্য কিনেছি।' মুকুল মুখ ভার করে বলে, 'শার্ট-প্যান্ট তো আমার অনেক আছে। আমাকে একটা মোবাইল ফোন কিনে দিতে হবে।' মা তাকে বলেন, 'বাবা মোবাইলের কি দরকার? পড়ালেখা করে বড় হও তারপর তুমি নিজেই কিনতে পারবে।'

মায়ের কথায় মুকুলের রাগ বেড়ে যায়। সে গোখরা সাপের মতো ফুঁসে ওঠে। মায়ের দেয়া উপহারের প্যাকেট তার দিকে ছুঁড়ে মারে। মা মাস্টারি মেজাজে মুকুলের দিকে তাকিয়ে ধমক দেন, 'বেয়াদব ছেলে।' মুকুল রাগে ফোঁস-ফোঁস করতে করতে ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

মা ডাকেন, কিন্তু সে পিছন ফিরে তাকায় না। মুকুল রাস্তায় নেমে দ্রুত পায়ে হাঁটতে থাকে। কোথায় যাবে কিছু ভেবে পায় না। সামনে আবুল মিয়ার চায়ের দোকান। ধূমায়িত চায়ের গন্ধ তার নাকে আসে। চা পান করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু ছোট মানুষ দোকানে গিয়ে চা খেতে কেমন কেমন যেন লাগে। মুকুলের মনে পড়ে প্রতিদিন সকালে মা নাস্তার পর এককাপ করে চা খেতে দেন তাকে। রাতে দেন পুরো এক গ্লাস দুধ। বিকেলে ঝালমুড়ির সাথে চা। মায়ের হাতের ঝালমুড়ি আর চায়ের মজাই আলাদা। মায়ের ওপর থেকে রাগ কমতে থাকে। কিন্তু না। মুকুল সহজে দমবে না। মোবাইল তাকে নিতেই হবে। মনটাকে সে আবার শক্ত করার চেষ্টা করে।

হাঁটতে হাঁটতে নাঈমের সাথে দেখা হয়। নাঈম প্রশ্ন করে, 'কি রে মুকুল কোথায় যাচ্ছিস?' মুকুল বলে, 'কোথাও না এমনি হাঁটছি।' নাঈম ওর সাথেই এবার ক্লাস ফাইভ ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করলো। ওর রেজাল্টও একেবারে খারাপ নয়, সে এবার থার্ড হয়েছে। নাঈম মুকুলের হাত ধরে বলে, 'চল, তা হলে আমাদের বাসায়।'

www.pathagar.com

মুকুল বিনা বাক্য ব্যয়ে নাঈমের হাত ধরে হাঁটতে থাকে। নাঈম মুকুলের কাছে জানতে চায়, 'তুই কোথায় ভর্তি হবি?'

মুকুলের পাল্টা প্রশ্ন, কেন? ঝাওয়াইল মহারাণী হেমন্ত কুমারী উচ্চ বিদ্যালয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা নাঈমদের বাসায় চলে আসে। নাঈম ওকে রিডিং রুমে নিয়ে বসায়। তারপর বলে, 'এই যে দেখ ক্লাস সিক্সের বই। আমার এক মামাতো ভাই গোপালপুর সূতী ভিএম পাইলট হাইস্কুলে পড়ে। সে এবার ক্লাস সেভেনে উঠলো। তার বইগুলো আমি নিয়ে এসেছি। তুই বইগুলো দেখতে থাক। আমি মাকে বলি আমাদের ফার্স্ট বয় এসেছে, তার জন্য কিছু নাস্তা বানাও।'

নাঈমের কথায় মুকুলের মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে। নাঈম ভিতরে চলে যায়। মুকুল বইগুলো উল্টেপাল্টে দেখতে থাকে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বইয়ের একটি চ্যাপ্টারে গিয়ে তার চোখ আটকে যায়। সে পড়তে থাকে 'ইসলামে মায়ের মর্যাদা' নিবন্ধটি। আল্লাহ তায়ালা মা-বাবার কথার বিপরীতে 'উহু' শব্দটি বলতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (সা.) কে একবার একজন সাহাবী এসে প্রশ্ন করলেন, সবচেয়ে বেশী মর্যাদা কার? তিনি তিন বার মায়ের কথা বলে তারপর বাবার কথা বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত। অর্থাৎ মায়ের খেদমত না করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না।

মুকুল ভাবতে থাকে তার মা অন্য সবার চেয়ে আলাদা। তিনি তাকে একই সাথে মায়ের স্নেহ এবং বাবার আদর দিয়ে অনেক কষ্ট করে তিলে তিলে বড় করে তুলছেন; আর সে কিনা একটা মোবাইলের জন্য মায়ের মুখের উপর তার দেয়া উপহার ছুঁড়ে মেরেছে। না, সে আর ভাবতে পারছে না, তার মাথা ঘুরছে। টেবিলে মাথা রেখে মুকুল কাঁদতে থাকে।

কিছুক্ষণ পর মায়ের হাতে তৈরি এলোকেশি পিঠা আর চা নিয়ে নাঈম আসে। তাকে দেখে মুকুল মাথা তুলে চোখ মুছতে থাকে। নাঈমের বুঝতে দেরী হয় না, মুকুল এতক্ষণ ধরে কাঁদছিল। সে কান্নার কারণ জানতে চায়। মুকুল তার বন্ধু নাঈমের কাছে সব কথা খুলে বলে। নাঈম তাকে বলে, 'বন্ধু নাস্তা করে চল। আমিও যাব খালাম্মার কাছে। মায়ের ক্ষমার দুয়ার সব সময় সন্তানের জন্য খোলা। তিনি তোমাকে কত ভালবাসেন তা তো আমরা জানি। তুমিই তার ভালবাসার পৃথিবী।' মুকুল কান্নার বেগ থামাতে থামাতে বলে, 'আমিও মাকে খুব ভালবাসি। তারপরও কেন যে এমন হলো।'

নাঈম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'চলো তোমার ভুল ভেঙ্গেছে বুঝতে পারলে খালাম্মা খুব খুশী হবেন।'

www.pathagar.com

মায়ের হাসি

'মা, ঢাকা খুব বড় শহর তাই না? আমরা যে টেলিভিশন দেখি, রেডিও শুনি তার সেন্টারও তো ঢাকায়। খুব মজা হবে ঢাকা গেলে তাই না? ....।'

নবাব আলী যেদিন থেকে ঢাকা যাওয়ার কথা শুনেছে সেইদিন থেকেই এমন হাজার কথার খই ফুটছে। মুখটা বন্ধই হয় না। ছেলেটা দু'দিন পর ঢাকা চলে যাবে। তাই মা বিরক্ত না হয়ে একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। নবাব আলীর মামা আজিম উদ্দিন ঢাকায় চাকরি করেন। তার অফিসের বড় স্যার বাসার কাজের জন্য একটা ছেলে চেয়েছেন তার কাছে। হাজার হোক বড় স্যার, তাকে ছেলে না দিলে কেমন হয়? একথা ভাবতে ভাবতে মেসে ফিরেন আজিম। বড় স্যারের নাম শাহজাহান চৌধুরী। তিনি অনেক বড় লোক। ঢাকার ফার্মগেটে

www.pathagar.com

চৌধুরী টেকনোলজি নামের একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক শাহজাহান সাহেব। চৌধুরী টেকনোলজি একটি কম্পিউটার ফার্ম। বিদেশ থেকে কম্পিউটার এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ আমদানি করে প্রতিষ্ঠানটি। এখন আর শুধু আমদানি নয় চৌধুরী টেকনোলজি যুক্ত হলো রফতানি বাণিজ্যের সাথেও। এখন থেকে সফটওয়্যার তৈরি করবে বিদেশে রফতানির জন্য। নবাব আলী কিংবা তার মামা আজিম উদ্দিনের অবশ্য এ সবের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আজিম পিয়নের চাকরি করেন। তিনি প্রতিদিন কম্পিউটারগুলো দেখেন। ধুলোবালি পরিষ্কার করেন। এই যন্ত্রটি দিয়ে অনেক কাজ করা যায় তাও তিনি জানেন। কিন্তু নিজে এসব চালাতে পারেন না।

গ্রাম থেকে কাজের ছেলে আনার জন্য তিন দিনের ছুটি পেয়েছেন আজিম। বাড়ি এসে তিনি তার স্ত্রীর নিজ হাতে বানানো মুড়ির মোয়া আর এক গ্লাস পানি খান। তারপর ছুটেন পাশের গ্রামে বোনের বাড়ির দিকে। আজিম উদ্দিনের গ্রাম মাদারজানি থেকে বোনের বাড়ি সূতী পলাশের দূরত্ব বেশী নয়। খুব বেশী হলে তিন কিলোমিটার হবে। পায়ে হেঁটে যেতে এক ঘন্টার মত সময় লাগে। আজিম পথ চলতে চলতে ভাবেন, দুলাভাই মারা যাওয়ার পর তিনজন এতিম সন্তান নিয়ে তার বোনটা কষ্টে আছে। নবাব আলীকে একটা কাজে লাগাতে পারলে কিছুটা হলেও তার বোঝা কমবে। এক দেড় হাজার টাকা মাসে পেলে মন্দ কি? ওর তো আর লেখাপড়া করে জজ-ব্যারিস্টার হওয়ার সুযোগ নেই।

দু'দিন পরের কথা। আজ নবাব ঢাকা যাচ্ছে। ওকে ঢাকা পাঠাতে ওর মাও ওর মামাবাড়ি এসেছেন। মা-মামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নবাব ওর মামা আজিম উদ্দিনের হাত ধরে হাঁটছে। অন্যদিনের মত আজ কেন যেন তার ভাল লাগছে না। হৃদপিন্ডটা অন্য দিনের চেয়ে একটু বেশী লাফাচ্ছে। মাথাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। চোখ দু'টো ছল ছল করছে। মায়ের মুখ, গ্রামের মাঠঘাট, ধান ক্ষেত, হেলেঞ্চা বিল, ঝিনাই নদীর পানি, দক্ষিণ চরার বট গাছের ছবি এক এক করে ভেসে উঠছে তার মনের পর্দায়।

গোপালপুর গিয়ে আজিম মামা ওকে নিয়ে ঢাকার বাসে ওঠেন। দ্রুতগতিতে চলছে বাস। নবাব আলীর মাথা ঘুরছে। ওর বমি বমি লাগে। মনের পর্দার ছবিগুলো ঝাপসা হতে হতে আস্তে আস্তে হারিয়ে যায়।

'মামা এটা কি রাজবাড়ি?' নবাবের প্রশ্নে আজিম হেসে বলেন, 'না রে পাগল, এটাই মালিকের বাড়ি। এই বাড়িতেই তুই আজ থেকে কাজ করবি, থাকবি, ঘুমাবি।' তাই ... এই বাড়িতেই সে আর কথা বলতে পারে না, তার গলাটা

www.pathagar.com

শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মেম সাহেবের কাছে নবাব আলীকে বুঝিয়ে দিয়ে আজিম অফিসে চলে যায়। মেম সাহেব আলীকে জিজ্ঞেস করেন, 'তোর নাম কি?' মেম সাহেব ওর নাম শুনে বলেন, নবাব! তা কোন নবাব, সিরাজুদ্দৌলা না কি মুর্শিদকুলি খাঁ?

নবাব আলী বলে, 'না মেম সাহেব আমার নাম শুধু নবাব আলী।'

মেম সাহেব বলেন, 'না তোর নাম আজ হতে নবু।'

মেম সাহেবের কথা শুনে নবাব আলীর মনটা খারাপ হয়ে যায়। সে মনে মনে ভাবে, ঢাকার মানুষ এমন কেন? তার নামটাকে নষ্ট করে ফেললো। কাজের লোক বলে কি তার ভাল নাম থাকতে নেই।

নবাব তার এ মনের কষ্টের কথা মুখ ফুটে বলল না। কারণ আজিম মামা মেম সাহেবের মুখে মুখে কথা বলতে বারণ করে গেছেন।

নবাব আলী ঢাকা এসেছে এক মাস হয়ে গেছে। প্রথমদিকে একটু সমস্যা হলেও এখন সে বাসার সব কাজ পারে। সাহেব, মেম সাহেব লোক খুব একটা খারাপ নন। ওকে খাওয়ার তেমন কষ্ট দেন না। থাকার ব্যবস্থাও মন্দ নয়। ছোট সার্ভেন্ট রুমে একটা ফ্যান ও একটা মশারি আছে। তারপরও বাড়ির জন্য ওর মনটা মাঝে মাঝেই কেঁদে ওঠে। মাস শেষ হওয়ার দুই দিন আগে এসে ওর মামা ওর এ মাসের বেতনের টাকা নিয়ে গেছেন। তার মায়ের কাছে এতদিনে সে টাকা হয় তো পৌঁছেও গেছে। বাড়ি যাওয়ার জন্য মামার সামনে নবাব আলী কান্নাকাটিও করেছে। সে এসেছে এক মাসই হয়নি, তাই তাকে ছুটি দেননি মেম সাহেব। মামাও বুঝিয়ে বলেছেন, বাড়িতে শুধু কষ্ট, এক মুঠো ভাত খাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করতে হয়। তারপরও প্রতিদিন পেটপুরে খাওয়া মেলে না, তাই মামা তাকে নিয়ে যাননি।

মামা চলে যাওয়ার পর নবাব আলী ঢাকার আর গ্রামের সুখের হিসাব কষতে বসে। সে মনে মনে ভাবে মায়ের হাতের রান্না কচুশাকের যে স্বাদ, ঢাকায় মুরগির গোশতও তেমন স্বাদ লাগে না কেন? তার মনে পড়ে, কার্তিকের শেষে নালা-ডোবার পানি যখন কমতে কমতে শুকাতে থাকে তখন সেই পানি সেচে কই, মাগুর, শিং, টাকি, পুটি ধরতে কতই না মজা। পেঁয়াজের পাতা দিয়ে মূলা, টাকি মাছ, ভাজি, পেঁয়াজ দিয়ে ভাজি করা ডানকানা মাছের স্বাদ এই শহরে কোন কিছুতেই নেই। 'নবাব আলী' ডাক শুনে তার চিন্তার ছেদ পড়ে।

এ বাড়িতে শুধু শাওনই তাকে এই নামে ডাকে। শাওন শাহজাহান চৌধুরীর ছেলে। তার বয়স নবাব আলীর চেয়ে খুব একটা বেশি হবে না। সে ঢাকার

www.pathagar.com

একটি ইংলিশ মিডিয়াম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়ে। নবাব আলী একদিন তার কাছে জানতে চেয়েছিল, সে তাকে পুরো নাম ধর ডাকে কেন? উত্তরে শাওন তাকে জানিয়েছে, তার স্কুলে অন্য সব বইয়ের সাথে পবিত্র কোরআনও পড়ানো হয়। কোরআনে আল্লাহতায়ালা কাউকে বিকৃত নামে ডাকতে নিষেধ করেছেন। তাই সে তাকে নবু না বলে নবাব আলী নামে ডাকে।

নবাব আলী শাওনের কাছে জানতে চেয়েছিল তার মা-বাবা কি এ পড়া পড়েননি। শাওন কিছু একটা বলতে যাবে, এমন সময় তার মা তাকে ধমক দিয়ে বলে 'কি ব্যাপার শাওন, তোমাকে না কতদিন নিষেধ করেছি কাজের লোকের সাথে মিশবে না?' মায়ের কড়া ধমক খেয়ে শাওন চলে যায়। তারপর যদিও শাওনের সাথে তার অনেক কথাই হয়েছে, কিন্তু একথা আর জিজ্ঞেস করা হয়নি।

এবার ঈদের আগে নবাব আলী তিনদিনের ছুটি পেয়েছে। মায়ের সাথে দেখা করে তাকে আবার ঈদের আগেই ফিরতে হবে। কারণ ঈদের দিন সাহেবের বাড়িতে অনেক কাজ আছে। সে না থাকলে এতসব করবে কে?

আজিম মামার সাথে নবাব আলী বাড়ি যাচ্ছে। সে মনে মনে ভাবে, ঢাকায় টেলিভিশন, রেডিও সেন্টার আরও কত কিছু আছে, কিছুই তো দেখা হলো না। বাড়ি থেকে এসে মালিকের বাড়িতে ঢোকার পর এই সে প্রথম বাইরে বের হলো। নবাব আলী তার ছোট ভাই, বোন, খেলার সাথী রমিজ, রমজানকে কি বলবে? না সে আর ভাবতে পারছে না, ভাবতে ভাবতে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়।

মেম সাহেব বেতনের টাকার সাথে তার মায়ের জন্য একটা শাড়ীও দিয়েছেন। নিশ্চয়ই অনেকদিন পর তাকে দেখে মা খুব খুশী হবেন। কথাটা ভাবতেই তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের হাসিমাখা মুখ। নবাব আলী ভুলে যায় সকল দুঃখ-কষ্ট যন্ত্রণা। ওদের নিয়ে দ্রুত গতিতে বাসটি চলছে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়ক ধরে। কিন্তু নবাব আলীর মনে হচ্ছে পথ যেন শেষ হচ্ছে না। বাসটি এক জায়গায় থেমে আছে। তার ইচ্ছে করছে বাস থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে গিয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকাতে।

www.pathagar.com

বসির আবার স্কুলে যাবে

বসিরের হাত থেকে বিড়ির মশলার ডালিটি পড়ার চেয়েও দ্রুত বেগে একটা থাপ্পড় পড়ল ওর গালে। টাল সামলাতে না পেরে সে পড়ে গেল। কাজিম উদ্দিনের যত মায়া ঐ মশলাগুলোর জন্য, বসিরের দিকে তাকানোর ফুসরত কোথায়? আবেদার মা হাতের কাজ ফেলে বসিরের কাছে আসে। ছেলেটি পড়ে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উঠার মত শক্তি ওর গায়ে নেই।

বসিরের হাত ধরে ওঠাতে গিয়ে আবেদার মা চিৎকার করে ওঠে, ও মা জ্বরে যে ছেলেটার গা পুড়ে যাচ্ছে। কাজিম উদ্দিনকে উদ্দেশ্য করে বলে, আপনি মানুষ ...।

কাজিম ধমক দেয়, চুপ মাতারি। আর একটা কথা বললে চাকরি নট ...। হ্যাঁ, কাজিম উদ্দিনের সে ক্ষমতা আছে। সে এই লাকী বিড়ি ফ্যাক্টরীর শ্রমিক-সর্দার। মালিকের খাস চামচা। কোন কাজ করে না। শুধু হামকি ধামকি করাই তার কাজ। তারপরও সবার চেয়ে তার বেতন বেশি। আবেদার মা আর কথা

www.pathagar.com

বাড়ায় না। বসিরকে উঠিয়ে বলে, যা আজ বাড়ি যা, জ্বর শরীর নিয়ে কাজে এসেছিস কেন?

বসির টাল সামলিয়ে উঠে দাঁড়ায়। তারপর হাত জোড় করে কাজিম উদ্দিনের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, উস্তাদ আমার আজকের মাইনেটা দিলে ওষুধ কিনে নিয়ে বাড়ি যাব। শরীর ভাল হলে আবার আসবো।

এই কিসের মাইনে চাস। মশলা ফেলে যে ক্ষতি করলি তার দাম দিবে কে? কাজিম ধমক দেয়।

ওস্তাদ। আমি তো এই বেলায় প্রায় পাঁচশ' বিড়ি বেঁধেছি। দশ টাকা পাই। সেখানে আমারে না হয় ৮ টাকা দেন। ওষুধ আর রুটি নিয়ে বাড়ি যাব। সকাল থেকে আমরা কিছু খাইনি।

কাজিমের পাষাণ হৃদয় একটু নরম হয়। এই নে পাঁচ টাকা। বলে চক চকে একটা কয়েন এগিয়ে দেয়। বসির বিনা বাক্য ব্যয়ে কয়েনটি হাতে নেয়। কারণ সে জানে কয়েনটা না নিলে কাজিম উদ্দিন নিজের পকেটে পুরে ফেলবে।

কয়েনটি হাতে নিয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বসির। চকচকে কয়েনে ওর মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে। সে হারিয়ে যায় এক বছর আগের তার রূপালি অতীতে। বাবা-মা, ভাই-বোন নিয়ে বসিরদের ছিল সুখের সংসার। বসিরের বাবা চাকরি করতেন গাজীপুরের সোনালি স্পিনিং মিলে। মিলের কাছে দু'রুমের একটি ছোট বাসা নিয়ে ওরা থাকতো। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বসির মসজিদে গিয়ে বাবার সাথে ফজরের নামায পড়তো। তারপর নাস্তা শেষে বাবার হাত ধরে বসির আর ওর ছোট বোন বুশরা স্কুলে যেত। বাবা ওদের স্কুলে রেখে চলে যেতেন মিলে। ছুটির পর মা স্কুল থেকে ওদের নিয়ে আসতেন। বসিরের স্বপ্ন ছিল বড় হয়ে সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। বুশরা হবে ডাক্তার। না বসির আর ভাবতে পারে না। সে দিনের সেই ঘটনার কথা সে ভাবতে চায় না। কিন্তু তারপরও বার বার মনে পড়ে। দুঃস্বপ্নের মত ওকে পিষে মারতে চায়।

সেদিন ছিল রোববার। অন্যান্য দিনের মত স্কুল থেকে এসে বসির আর বুশরা টিভিতে কার্টুন দেখছিল। হঠাৎ খবর এলো ওর বাবা এক্সিডেন্ট করেছে। তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। মার সাথে ওরা দু'ভাই বোন হাসপাতালে গেল। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। ওর বাবাকে ঢেকে রাখা হয়েছে সাদা ধবধবে কাপড়ে। যেদিন ওদের বাবার গায়ে সাদা কাপড় উঠলো, সেদিন থেকেই ওদের সুখ ঢাকা পড়েছে কালো কঠিন পর্দার অন্তরালে।

www.pathagar.com

একটা শীতল হাতের স্পর্শে পিছন ফিরে তাকায় বসির। সে চমকে উঠে। কাকে দেখছে সে। লাকী বিড়ি ফ্যাক্টরির মালিক আবুল মিয়া না? ঘোর কাটার পর বসির সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম। মুচকি হেসে আবুল মিয়া সালামের উত্তর দেন, ওয়া আলাইকুম আস সালাম। মিষ্টি চেহারার ছেলেটির মুখে চোখ আটকে যায় আবুল মিয়ার। জিজ্ঞেস করেন তোমার নাম কি?

: বসির বিন সাঈদ

: বাড়ি কোথায়?

: দিঘুলিয়া পূর্বপাড়া।

: দিঘুলিয়ার সাঈদের ছেলে তুমি ...?

আবুল মিয়ার মনের ভিতর তোলপাড় শুরু হয়। সাঈদ আর তিনি একই স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। সাঈদ এসএসসি পাস করার পর মোমেনশাহী পলিটেকনিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। আবুল মিয়া তার বাবার ব্যবসার হাল ধরেন। তার স্কুল জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সাঈদ। রোড এক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার পর তার পরিবারের এমন করুণ অবস্থা হয়েছে। না, আবুল মিয়া আর ভাবতে পারছেন না। তিনি কাঁপা কাঁপা গলায় বলেন, আমার এখানে কাজ কর, তাতো কেউ বলেনি। ইস জ্বরে যে শরীর পুড়ে যাচ্ছে। কাজিম উদ্দিন, ওকে আমার রুমে নিয়ে আস।

কাজিম বসিরের হাত ধরে ওকে আবুল মিয়ার রুমে নিয়ে যায়। বসির ভাবে না জানি কপালে কী আছে? কাজটা চলে গেলে ওদের না খেয়ে মরতে হবে।

আবুল মিয়া কাজিমের হাতে পাঁচশ' টাকার একটি নোট দিয়ে বলেন, ওকে ভাল ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ পথ্য কিনে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে। আর বসির সুস্থ হয়ে আমার সাথে দেখা করবে। তোমাকে আর এ কাজ করতে হবে না। তোমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা করবো আমি।

বসির কাঁদতে কাঁদতে বলে, তা হলে আমার মা-বোন না খেয়ে মরবে।

আবুল মিয়া বসিরের মাথায় হাত রেখে বলেন, না মরবে না। আমি বেঁচে থাকতে আমার বন্ধু সাঈদের স্ত্রী সন্তান, না খেয়ে মরলে আল্লাহ আমাকে মাফ করবেন না।

www.pathagar.com

রাজপুত্রের বিদায়

বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে রাসেলের দস্যিপনা বেড়েই চলেছে। অবশ্য দুষ্টুমি, লেখাপড়া, খেলাধুলা সবকিছুতেই সে সবার সেরা। মায়ের ইচ্ছা সে শুধু লেখাপড়া করবে, দুষ্টুমি নয়। কিন্তু মায়ের আদর, স্নেহভরা শাসন ওকে শান্ত করতে পারছে না। স্বামীকে হারিয়ে রাসেলের মা ওর মুখের দিকে তাকিয়েই শত দুঃখ-কষ্টকে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রেখেছেন। রাসেলকে মানুষের মত মানুষ করতে হবে। তার এখন শুধু এই একটাই আশা। এই একটিই স্বপ্ন। তার জীবনের যত আয়োজন ওকে ঘিরেই।

রাসেলের বাবার ইচ্ছে ছিল তিনি ওকে বড় ডাক্তার বানাবেন। দেশের পড়া শেষ হলে বিদেশে পাঠাবেন আরও লেখাপড়া এবং গবেষণার জন্য। দেশের মানুষকে এ দেশীয় পদ্ধতিতে স্বল্প খরচে সুস্থ সুন্দর জীবন উপহার দেয়ার স্বপ্ন ছিল তার। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক হলেও এ্যালোপ্যাথি, ইউনানী, আয়ুর্বেদী চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে তিনি পড়াশোনা করতেন। তিনি বলতেন, শুধু শুধু মানুষ বিভিন্ন চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে ঝগড়া করে। সব পদ্ধতিরই উদ্দেশ্য মানুষকে রোগমুক্ত দীর্ঘজীবন উপহার দেয়া।

www.pathagar.com

রাসেলের জন্ম ওর বাবা-মার বিয়ের অনেক পরে। তারা ভেবেছিলেন হয়তো সন্তানের মুখ দেখার সৌভাগ্য তাদের হবে না। আল্লাহর দরবারে অনেক কান্নাকাটি করেন তারা। অবশেষে আল্লাহতায়ালা তাদের দোয়া কবুল করেন। ঘর আলো করে আসে রাজপুত্রের মত সুন্দর ফুটফুটে রাসেল। সময়ের কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে বড় হতে থাকে রাসেল। আস্তে আস্তে মুখে কথা ফোটে। নানান বায়না ধরে। গল্প শুনতে চায়। প্রতিরাতে গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ায় ওর মা। রাজা-রানী, রাজপুত্র, রাজকন্যার গল্প ওর খুব ভাল লাগে। রাসেল ওর মাকে প্রশ্ন করে, 'এখন রাজপুত্ররা কোথায় থাকে?' মা বলেন, 'কেন এই তো আমার বুকে একটা রাজপুত্র।' ফিক করে হেসে ওঠে রাসেল। তারপর হারিয়ে যায় ঘুমের রাজ্যে।

কয়েক বছর পরের কথা। রাসেল এখন স্কুলে যায়। লেখাপড়া, খেলাধুলা, গান, কবিতা আবৃত্তি সবকিছুতেই সেরা রাসেল। অন্য সবার চেয়ে ওর চেহারাটাও আলাদা। এমন সুন্দর ছেলে খুব কমই দেখা যায়। ওর বন্ধুরা তাই ওকে রাজপুত্র বলে ডাকে। প্রথম প্রথম রাসেল বন্ধুদের সাথে রাগ করতো। সে বলতো, আমি তো ডাক্তারপুত্র। রাজপুত্র হবো কেন? এখন আর রাগ করে না বরং মজা পায়।

সেই দুঃসহ দিনের কথা রাসেল তার মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। তখন সবেমাত্র সে ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠেছে। বরাবরের মত এবারও ফার্স্ট হয়েছে। কিন্তু কয়েকদিন যাবৎ সে স্কুলে যেতে পারছে না। তার বাবা অসুস্থ। সারাক্ষণ সে বাবার পাশে বসে থাকে। সময় মত ওষুধ খাওয়ায়, মাথার চুলে বিলি কেটে দেয়, কোরআন-হাদীস, পত্র-পত্রিকা, বই পড়ে শোনায়। নামাযের সময় তায়ম্মুম করে দেয়। তার বাবার অসুখটা কিছুতেই কমে না। কোন ওষুধপথ্য, ডাক্তার তাকে ধরে রাখতে পারলো না। পনের দিন পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

বাবাকে হারিয়ে রাসেলের বুকটা অশান্ত হয়ে ওঠে। ওর মা নিজের কষ্ট চেপে রেখে ওকে সান্ত্বনা দেন। বাবার স্বপ্ন পূরণের জন্য মন দিয়ে লেখাপড়া করতে বলেন। দুরন্ত সাহসী ও মেধাবী রাসেল। বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করার সময় অসম্ভব দুঃসাহসী সব বাজি ধরে। গাছ থেকে পুকুরে জাম্প দেয়। স্কুলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মাঠে। চন্দ্রডোরা সাপের লেজ ধরে মাথার ওপর ঘুরায়, মহিষের পিঠে চড়ে মাঠের পর মাঠ ঘুরে বেড়ায়, বৈরান নদীতে স্রোতের উজানে সাঁতার কেটে ওপারে যায়, মাথায় হেলমেট না পরে ক্রিকেট খেলতে মাঠে নামে ব্যাটিং করতে। এসব খবর মায়ের কানে আসে। মা রাসেলকে বুঝান। বাবা এমন সাহস দেখানো ভাল নয়। আর এমন করবে না। রাসেল অট্টহাসিতে ফেটে

www.pathagar.com

পড়ে। 'আমার কিছু হবে না মা। তুমি ভেব না।' মা ওকে ধমক দেন। 'কিছু হবে কি না হবে, তা আমি শুনতে চাই না। আমার আদেশ আর কোনদিন হেলমেট না পরে মাঠে নামবে না, সাপের লেজ ধরবে না, ছাদ থেকে লাফ দেবে না, নদী থেকে গোসল করে সোজা বাসায় চলে আসবে ...' মায়ের কথা শেষ হওয়ার আগেই ব্যাট হাতে নিয়ে দৌড়ে বাসা থেকে বের হতে হতে রাসেল বলে, মা আমি খেলতে যাচ্ছি ...

মা ওর পথের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

গোপালপুর সূতী ভিএম পাইলট হাই স্কুলের খেলার মাঠ। এখন বিকেল। শিক্ষকরা কেউ মাঠে নেই। ছুটির পর সাধারণত তারা থাকেন না। স্কুলের আশপাশের বাসার আর হোস্টেলের ছাত্ররা খেলাধুলা করে। রাসেল স্কুল ক্রিকেট টিমের সদস্য। আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতার প্রস্তুতির জন্য প্র্যাকটিস করছে ওদের টিম। রাসেল মায়ের কথামতো হেলমেট পরে ব্যাটিং করতে নামে। স্কুল ক্রিকেট টিমের সদস্য রাসেলের বন্ধু সাজন। রাসেলের এই পরিবর্তন দেখে সাজন বলে, 'কি রাজপুত্র, আজ হেলমেট ছাড়া নামতে সাহসে কুলাচ্ছে না?' সাজনের কথায় ফুঁসলে ওঠে রাসেল, 'কি বললি, সাহস হচ্ছে না মানে' বলতে বলতে হেলমেট খুলে ওর দিকে ছুঁড়ে মারে। সাজন হেলমেটটা হাতে নিয়ে বলে, 'এমনি এমনি বলেছি। রাসেল নে, পরে নে। রিস্ক নেয়া ঠিক না।' কিন্তু না, রাসেলের রাগ কমে না। সে চিৎকার করে বলে, 'কিসের আবার রিস্ক।'

খেলা শুরু হয়। তিন ওভারে পঁচিশ রান করে রাসেল। খেলা জমে উঠেছে। মাঠে টান টান উত্তেজনা। সাজন বোলিং করতে মাঠে নামে। সে বোলিং করছে এক দুই তিন ... হঠাৎ একটি বল দ্রুতবেগে আঘাত করে রাসেলের মাথায়। 'মাগো' চিৎকার করে পড়ে যায় রাসেল। সাজন দৌড়ে ওর কাছে যায়। আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করছিল টিমের সদস্য নাসির। সে চিৎকার করে বলে, 'একটা রিকসা নিয়ে আসো। এখনই হাসপাতালে নিতে হবে।' ক্রিকেট টিমের আরেক সদস্য বেলাল দৌড়ে গিয়ে একটি রিকশা নিয়ে আসে। রাসেলকে রিকশায় করে হাসপাতালে নিয়ে যায় ওর বন্ধুরা। দ্রুত গতিতে চলছে রিকশা। রিকশার চাকার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাসেলের হৃদকম্পন। হাঁপরের মত ওঠানামা করছে ওর বুক। হাসপাতালে নেয়ার পর জরুরি বিভাগের ডাক্তাররা দ্রুত ওর চিকিৎসা শুরু করেন। কিছুক্ষণ পর একজন ডাক্তার জরুরি বিভাগ থেকে বের হন। তিনি বিষণ্ন মনে ওর বন্ধুদের বলেন, 'দুঃখিত, আমাদের আর কিছুই করার নেই।'

www.pathagar.com

আসিফের শাপলাবাড়ি অভিযান

আসিফ গ্রামে যাবেই। তাকে কিছুতেই বুঝানো যাচ্ছে না। বর্ষাকালে গ্রামে যাওয়া নানান ঝক্কি-ঝামেলার কাজ। গাঁয়ের কাঁচা রাস্তাঘাট থাকে কাদায় ভরা। সেখানে রিকশা, মোটর সাইকেল, মোটরকার- এক কথায় যে কোন যানবাহন চালানো খুব কষ্টকর। একমাত্র বাহন নৌকা। তাও সব জায়গায় চলে না। গ্রামের রাস্তাগুলো আগের দিনে ছিল নিচু। রাস্তার ওপর দিয়ে ঠেলে নৌকা পার করা যেত, কিন্তু এখন রাস্তা এত উঁচু যে, তাও অসম্ভব। আর ব্রিজ-কালভার্টগুলো এত নিচু যে, পানি বাড়লে নীচ দিয়ে নৌকা চালানো যায় না। নৌকাডুবি, সাপ-বিচ্ছু, পোকামাকড়ের ভয় তো আছেই। তাই এমন দিনে কোন শহরবাসী গ্রামমুখী হতে চায় না। আসিফের বাবা-মারও ইচ্ছে নেই। আসিফকে বুঝাচ্ছেন, বর্ষার পর তারা গ্রামের বাড়ি বেড়াতে যাবেন। অফিস থেকে বেশিদিনের ছুটি নিবেন, তাকে গ্রামটা ঘুরে ঘুরে দেখানোর জন্য। কিন্তু আসিফের এক কথা সে বর্ষাকালেই গ্রামের বাড়ি যাবে। দাবি আদায়ের জন্য কেঁদে কেঁদে চোখ দু'টি লাল করে ফেলেছে। খাওয়া-দাওয়া বন্ধ, মানে অনশন, অগত্যা কি আর করা। তিনদিনের ছুটি নিয়ে আসিফের বাবা-মা গ্রামের বাড়ি গেলেন।

আসিফদের গ্রামের নাম শাপলাবাড়ি। টাঙ্গাইলের গোপালপুর উপজেলা শহর হতে প্রায় চার-পাঁচ কিলোমিটার দূরে তাদের গ্রাম। একথা অবশ্য কারো অজানা নয় গ্রামের কিলোমিটার শহরের চেয়ে বড়। কারণ এই কিলোমিটার চেইন দিয়ে মাপা শহুরের কিলোমিটার নয়, চোখে মাপা গেঁয়ো কিলোমিটার।

www.pathagar.com

শাপলাবাড়ি গ্রামের চারদিকে বিল আর ফসলের মাঠ। ফসল আবাদের মাঠকে এ অঞ্চলে চরা বলা হয়। বর্ষার সময় পানিতে বিল আর মাঠ একাকার হয়ে যায়। চারদিকে পানি আর পানি। তার মাঝে ছোট্ট সুন্দর একটি গ্রাম। যেন বিলের পানিতে ফোটা শাপলা ফুল। তাই তো গ্রামটির নাম শাপলাবাড়ি।

আসিফ এই প্রথম বর্ষাকালে গ্রামে এলো। সে একটি কঠিন মিশন নিয়ে এসেছে। তিনদিনের মধ্যে ওর মিশন শেষ করতে হবে। বাবার ছুটি শেষ হওয়ার আগে আসিফের মিশন শেষ করতেই হবে। কারণ ছুটি শেষ হলে বাবাকে একদিনও আটকে রাখা যাবে না। অতএব যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। আসিফ দুপুর বেলাটাকে তার অপারেশনের সময় হিসেবে বেছে নেয়। কারণ অন্য সময় বাবা-মার চোখকে ফাঁকি দেয়া কঠিন। গ্রামে এলে প্রতিদিন দুপুরে মা-বাবা ঘুমান। একদিন দুপুরে বাবা-মা যখন ঘুমাচ্ছেন, সেও তাদের সাথে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। তারপর বাবা-মার ঘুম গভীর হলে, সে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে বের হয় ঘর থেকে। ওর দাদু ও ছোট চাচা গেছেন গোপালপুর হাটে। বাড়ির অন্য লোকেরা যে যার কাজে ব্যস্ত। আসিফ পানির ধারে খুঁজতে থাকে তার কাংখিত বস্তু। 'এই তো পেয়ে গেছি। এখন ধরতে পারলেই হয়।' আপন মনে বলে ওঠে আসিফ। তারপর পা টিপে টিপে খুব সাবধানে ধরতে যায় তার কাংখিত বস্তুটিকে। কিন্তু না। পারে না। পা পিছলে সে পানিতে পড়ে যায়। শব্দ শুনে এগিয়ে আসে পাশের বাড়ির কাজের লোক কলিম। সে আসিফকে উদ্ধার করতে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর পানি থেকে তুলে চিৎকার করে লোকজন ডাকতে থাকে। গোলমাল শুনে আসিফের বাবা-মার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আসিফকে তাদের পাশে না দেখে আঁতকে ওঠেন। বাহির বাড়িতে লোকজনের জটলা দেখে এগিয়ে যান। গিয়ে দেখেন, বিশেষ কায়দায় আসিফকে শোয়ায়ে পেটের পানি বের করছেন গ্রামের একজন অভিজ্ঞ লোক। কিছুক্ষণ পর আসিফের জ্ঞান ফিরে। তার মা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করেন-

: তুমি পানিতে পড়লে কিভাবে?

: মামণি, আমি ব্যাঙ ধরতে গিয়েছিলাম।

: কেন বাবা?

: আমি তো 'কথা বলা ব্যাঙ' ধরতেই গ্রামে এসেছি।

: কথা বলা ব্যাঙ, সে আবার কি?

: ঐ যে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপনে বলে, 'কথা বলা ব্যাঙ'কে কিস্ করলে রাজকন্যা হয়ে যাবে। আমি সেই রাজকন্যাকে সাথে নিয়ে ঢাকা যাব।

আসিফের কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কেউ এমন বিষাদময় পরিবেশেও হো হো করে হেসে উঠে।

www.pathagar.com

আকাশ ছোঁয়ার গল্প

নাহিদ গ্রীষ্মের ছুটিতে দাদাবাড়ি এসেছে। সারাদিন ছুটোছুটি আর লুটোপুটি। এক মুহূর্তও স্থির থাকতে চায় না।

ওর দুরন্তপনায় মায়ের আরাম হারাম হয়ে গেছে। বাড়ির সামনে পুকুর। পিছনে বাগান। বড় রাস্তা পার হলেই নদী। মাঠের পর বিল ঝিল। না জানি কোথায় কখন গিয়ে কোন বিপদে পড়ে। তাই সারাক্ষণ ওকে চোখে চোখে রাখেন মা।

নাহিদের বিশ্বাস, সে ইচ্ছে করলেই আকাশটাকে ছুঁতে পারবে। দাদাবাড়ির পুকুর পাড়ে দাঁড়ালে ঐ যে দূরে গ্রামগুলো দেখা যায়, আকাশের শেষ তো ওখানে। সে মাকে বলল :

: মা আমি যাই।

: কোথায় যাবে?

: আকাশ ধরতে।

: মা হেসে বলেন : আকাশ কি ধরা যায়?

www.pathagar.com

কেন ধরা যাবে না, ঐ যে দূরের গাঁয়ে মাটির সাথে মিশে গেছে আকাশ।

: আকাশ নয়, আমাদের চোখের শেষ সীমানা ওটা। এরপর আমরা আর দেখতে পাচ্ছি না। তাই এমন দেখা যাচ্ছে। ঐটাকে বলে দিগন্ত রেখা।

: মানে?

: দিকের শেষ সীমানা।

মায়ের কথা শুনে মন খারাপ হয়ে যায় নাহিদের। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না। সে ভাবে মা আসলে ভীতু ওকে ছাড়তেই চায় না।

ঢাকায় গেলে দেখায় ছেলেধরার ভয়। গ্রামে তো ভয়ের শেষ নেই। পুকুরে যাবে না, সাপ আছে। বাগানে যাবে না সাপ-বিচ্ছু, পোকায় কামড় দিবে। নদীতে কুমির আছে। মাঠে রোদে দৌড়ালে কালো হয়ে যাবে। তাহলে সে করবেটা কী? গ্রামে এসে কী লাভটা হলো? সে মনে মনে পণ করে আকাশ তাকে ছুঁতেই হবে। যে করে হোক, এ কাজটা সে করবেই। তা না হলে স্কুলে গিয়ে সে বন্ধুদেরকে গ্রামের কোন গল্প শোনাবে। আম খাওয়া, পুকুরে গোসল করা, চাচার সাথে নদীতে মাছ ধরা- এসব গল্প তো অপু, তপু, জিনিয়া, লোপা, আভা, প্রভা, জিদান সবাই করবে। নাহিদের ইচ্ছে সে সবাইকে অবাক করে দিবে আকাশ ছোঁয়ার গল্প বলে। ওর দাদাবাড়িতে এমন আকাশ আছে, এ কথা সেও কি আগে জানত। নাহিদ মনে মনে হাসে, জানবে কি করে সে তো তখন অনেক ছোট ছিল। এখন ওর বয়স পাঁচ প্লাস। সে অনেক বড় হয়েছে। অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে।

ছোট চাচার ছেলে নাজিম, পাশের বাড়ির কাজিম, নায়েমকে নিয়ে মিটিং করে নাহিদ। ওদের বয়স চার থেকে ছয়। নাহিদের কথা শুনে সবাই অবাক। অত ওপরের আকাশ হাত দিয়ে ধরা যাবে। বাঃ বাঃ কত মজা হবে। নাহিদ সবাইকে বুঝিয়ে বলে আগামীকাল খুব ভোরে ওরা শুরু করবে আকাশ ছোঁয়ার অভিযান।

পরদিন সকালে বাবা-মার চোখ ফাঁকি দিয়ে ওরা তিনজন হাঁটতে শুরু করে পশ্চিমদিকে। শুধু নায়েম আসেনি। সে পালাতে পারেনি। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায়, ওর আব্বু ওকে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এজন্য নায়েমের মনটা খুব খারাপ। ওরা আকাশটা হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখবে কত মজা করবে, আর নায়েম তা পারছে না। কেন যে ঘুম ভাঙ্গলো না।

বেলা বাড়ার সাথে সাথে নাহিদ, নাজিম আর কাজিমকে খোঁজা শুরু হলো। কোথায় গেল ওরা তিনজন? নাহিদের মা নাজিমের বাবা-মা, ফাহিমের বাবা-মা, ওদের দাদা-দাদী, চাচা-চাচী সবাই ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে লাগলো ওদের। পুকুরে

www.pathagar.com

জাল ফেললো। বিল ঝিলও বাদ পড়লো না। নাজিমের বাবা মাইক লাগিয়ে নিখোঁজ সংবাদ প্রচার শুরু করলেন। বেলা বাড়ার সাথে সাথে কান্নার রোল উঠলো গ্রাম জুড়ে। নায়েম স্কুল থেকে ফিরে এত কাণ্ড দেখে হাসে। ওর মাকে বলে ওদের তো কিছু হয়নি। ওরা আকাশ ধরতে গেছে। আকাশটা ছুঁয়ে ঠিক চলে আসবে। ওর কথার আগামাথা কিছু বুঝতে পারে না নায়েমের মা। নাহিদের মাকে কথাটা বলতেই তার মনে পড়ে যায় নাহিদ তাকে আকাশ ছোঁয়ার কথা বলেছিল। চারটি মোটর সাইকেল নিয়ে আটজন ছুটে চারদিকে।

নাহিদের ছোট চাচা জাহিদ পশ্চিম দিকে ত্রিশ মিনিট চলার পরই দেখা পায় তিন অভিযাত্রীর। রোদ আর ক্ষুধায় কালো হয়ে গেছে নাহিদ, নাজিম আর ফাহিম। চাচাকে দেখে ভয়ে পালাতে চায়। কিন্তু যাবে কোথায় ...

চাচা ওদের বলেন, তোমরা হেঁটে হেঁটে কত দূর এসেছো জানো?

ওরা হা করে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না।

: এই গ্রামের নাম ফুলতলী।

নাহিদের মনে পড়ে সে দাদাবাড়ির পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়ে মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করছিল, মা ঐ যে আকাশটা নিচু হয়ে নেমে আছে ঐ গ্রামের নাম কি?

: ফুলতলী। মা তো ফুলতলীই বলেছিলেন।

নাহিদ ভাবে, চাচার কথা যদি সত্য হয় তা হলে আকাশ কোথায়?

ওর চাচা বললেন, চল এ গ্রামে আমার এক বোনের বাড়ি। তোমার জুঁই ফুফুর বাড়ি। জুঁই ফুফির নাম শুনে খুশিতে পথ চলার ক্লান্তি ভুলে যায় নাহিদ। মোবাইল ফোনে ওদের খোঁজ পাওয়ার খবর সবাইকে জানিয়ে দেন ওর ছোট চাচা।

নাহিদ, নাজিম, ফাহিমকে নিয়ে ওর চাচা জুঁই ফুফির বাড়ি যায়। ফুফি ওদের দেখে খুব খুশি হন। মোরগ জবাই করেন। পোলাও রান্না করেন। খেতে বসে নাহিদ ওর চাচার কাছে জানতে চায়, চাচ্চু আকাশটা আবার উপরে উঠলো কিভাবে? চাচা বলেন, এই যে আমার মোটর সাইকেলটা দেখছো। এটায় চড়ে হাজার হাজার মাইলও যদি যাও, তারপরও তুমি আকাশটাকে ছুঁতে পারবে না। শুধু মনে হবে ঐ তো আকাশের শেষ সীমানা।

www.pathagar.com

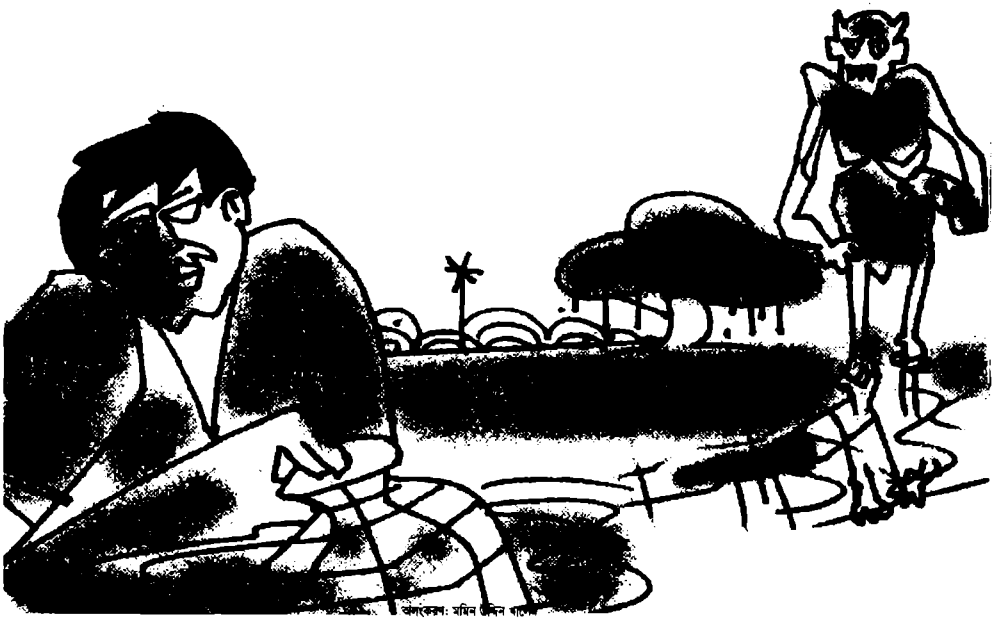

হারাবিল

হারাবিল নামটি শুনলেই গা ছম ছম করে। ঐ বিলে মাছ ধরতে গিয়ে কতজন যে হারিয়ে গেছে তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। এই জন্যই এ বিলের নাম হারাবিল। প্রতি অমাবস্যার রাতে হারাবিলে মেছো ভূতদের দরবার বসে। সেদিন বিলের সব মাছ ভেসে ওঠে। জাল ফেললে আর কথা নেই। ঝাঁকে ঝাঁকে কৈ, শিং, মাগুর, পাবদা, পুটি, টাকি, রুই-কাতলা ধরা পড়ে। কিন্তু কার বুকের পাটায় এতো সাহস অমাবস্যার রাতে জাল ফেলবে হারাবিলে। নবগ্রাম, মাদারজানি, গোপালপুর, ভুয়ারপাড়া এই চার গাঁয়ের সীমানা জুড়ে হারাবিল। আর চার গাঁয়ের বুড়োরাই জানে অনেক অনেক কাহিনী। মাদারজানির সোলেমান বুড়োর

www.pathagar.com

বয়স আশির ওপর। তার কাছে জিজ্ঞেস করলে বলবে- আর বল না, সেই সব দিনের কথা। একবার হলো কি জান? পাশের বাড়ির বদির ছিল রংপুরের এক কামলা। তার আবার ছিল মাছ ধরার খুব শখ। সারাদিন কাজ করে, আর সারারাত মাছ ধরে। তারে পেয়ে বসল মাছের নেশায়। একবার এক কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাতেও সে গেল মাছ ধরতে। তার অবশ্য অমাবস্যার কথা মনে ছিল না। মনে থাকলে কি আর যায়। সে আর ফিরে আসেনি। তার লাশও বিলে পাওয়া যায়নি। সোলোয়ানকে নছু একদিন জিজ্ঞেস করলো- দাদু, তার বাড়িতে কি বদি দাদু খোঁজ নিয়েছিল। সেই রংপুর ... আজকের কথা, কে যাবে খোঁজ নিতে? সোলেমান চোখ বন্ধ করে উত্তর দেয়। নবগ্রামের নবুর বয়স একশ' ছুঁই ছুঁই। তার কাছেও জমা আছে হারাবিলের সত্যি সত্যি ভূতের অনেক গল্প। একবার হলো কি জান? নবু দাদু তার গল্প শুরু করেন- সেদিন ছিল শনিবার। তারপর আবার অন্ধকার রাত। বাবার সাথে গিয়েছিলাম গোপালপুর হাটে। বেচাকেনা করে ফিরতে রাত হয়ে যায়। বাবা বড় একটা ইলিশ কিনে দিল আমার হাতে। আমি আগে আগে ইলিশ হাতে লাফিয়ে লাফিয়ে পথ চলছি। বাবা পিছনে। বিলের কাছে আসতেই আমার গায়ে লাগলো গরম হাওয়া। আর যাই কোথায়। আমার শরীরের সব কয়টি লোম দাঁড়িয়ে গেল। আমি এক পাও নড়তে পারছি না। বাবা কামেল মানুষ, জিন ভূত সবাই তাকে ভয় পেত। তিনি এসে বললেন, কিরে নবু, দাঁড়িয়ে আসিছ কেন? আমি বললাম, বা... বা... ভূ... ত।

বাবা বললেন, কোথায় ভূত। বাবা আমাকে সাহস দিলেন বুঝলাম। কিন্তু বাড়ি এসে আমার গাঁ কাঁপিয়ে জ্বর এলো। সেই জ্বরে পড়েছিলাম সাত দিন। ইলিশ মাছ মা আমাদের কাউকে খেতে দেননি। রান্না করে ফকিরদের দাওয়াত করেছিলেন। তারাই সব খেয়েছে। গোপালপুরের গনেশ খুড়োর বয়সও কম নয়। দেখে বুঝা না গেলেও কষ্টি মতে তার বয়স নব্বই। তার গল্প আরও মজার। একবার হলো কী- তিনি তার দাদুর সাথে গেছেন মাছ ধরতে। প্রচুর মাছ ধরা পড়ছে জালে। কখন যে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমেছে তা খেয়ালই করেননি। হঠাৎ তিনি তাকিয়ে দেখেন বিলের পানি লাল হয়ে উঠেছে। ভয়ে তার গা কাঁটা দিয়ে উঠল। খুড়ো তার দাদুকে বলল, আর নয় চল চলে যাই। দেখ না বিলের পানি কেমন লাল দেখাচ্ছে। এখন ভূতরা জেগে উঠবে। বুড়োর মনে যেন ভয়ডর নেই। কেনই বা থাকবে? শত শত মন্ত্র ছিল তার মুখস্ত। তিনি মন্ত্র পড়তে পড়তে বললেন, গনেশ ভূতেরা সূর্য ডুবার সময় জাগে না। একটু পর জাগবে। দেখবে

www.pathagar.com

তখন বিলের পানি কালো হয়ে যাবে। দাদুর কথাই সত্যি হলো। সূর্য ডোবার সাথে সাথে বিলের পানি কালো হয়ে গেল। দাদু মন্ত্র পড়ে আমার বুকে ফুঁ দিয়ে বললেন, ভয় করিস না। ভূতরা আমাদের কিছু বলবে না। চল বাড়ি যাই। আর মাছ ধরবো না। মন মনে খুব খুশি হলাম। দাদু সাথে না থাকলে কি যে হতো সেদিন।

ভুয়ার পাড়ার নয়া চান দাদা এক সময় সারা দিন-রাত বিলেই কাটাতেন। মেছো ভূতরা তাকে খুব খাতির-যত্ন করতো। বিলের মেছো ভূতরা অমাবস্যার রাতে তাদের দরবারে তাকে দাওয়াত দিয়েছিলো। তিনি প্রতি রাতেই বড় বড় মাছ ধরে আনতেন। মাছ দেখিয়ে সবাইকে বলতেন, দেখ দেখ মেছো ভূতের রাজা আমাকে নিজ হাতে এ মাছ ধরে দিয়ে বলছে, তুই সবাইকে বলে দিবি মাছ ধরতে যেন হারাবিলে রাতের বেলা কেউ না আসে। আমরা ভূতরা মিলে কিন্তু তার ঘাড় মটকে দিব। নয়া চান দাদু এখন আর বেঁচে নেই। তার বলা এসব গল্প আশপাশের গাঁয়ের সবাই জানে।

নবগ্রামের নছুও ভূতদের সাথে খাতির জমিয়ে হারাবিলে রাতে মাছ ধরতে যায়। বড় বড় মাছ ধরে আনে। নিজে খায়, বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। বিলের মেছো ভূতের রাজার সাথে তারও একদিন দেখা হয়েছে। নছুর কাছ থেকেই চল শুনি সেই গল্প- একদিন নছু মাছ ধরছে আর খালইয়ে রাখছে। কিন্তু খালই ভরছে না। কারণ কি দেখার জন্য যেই না পিছনে তাকিয়েছে, দেখে ইয়া বড় বড় চোখ, পানির ওপর পা তুলে হাঁটছে একটি কালো কুচকুচে লোক। নছুর হাত-পা ভয়ে কাঁপতে লাগলো। সে তাকে বলল, ভয় পাসনে। আমি তোকে কিছুই করবো না। নয়া চানের পর তোকেই শুধু রাতে মাছ ধরার অনুমতি দিলাম। কথাটা সবাইকে বলে দিস। অন্য কেউ এলে, একদিন, দুইদিন, তিন দিন হয় তো কিছু বলবো না ... কিন্তু যেদিন সুযোগ পাবো ঘাড় মটকে রক্ত খাবো ... নছুর কাছে এই গল্প শোনার পরও অনেকে ভয়ে ভয়ে রাতে মাছ ধরতে যায় হারাবিলে। কিন্তু মেছো ভূতের রাজার সাথে আর কারো দেখা হয় না।

www.pathagar.com

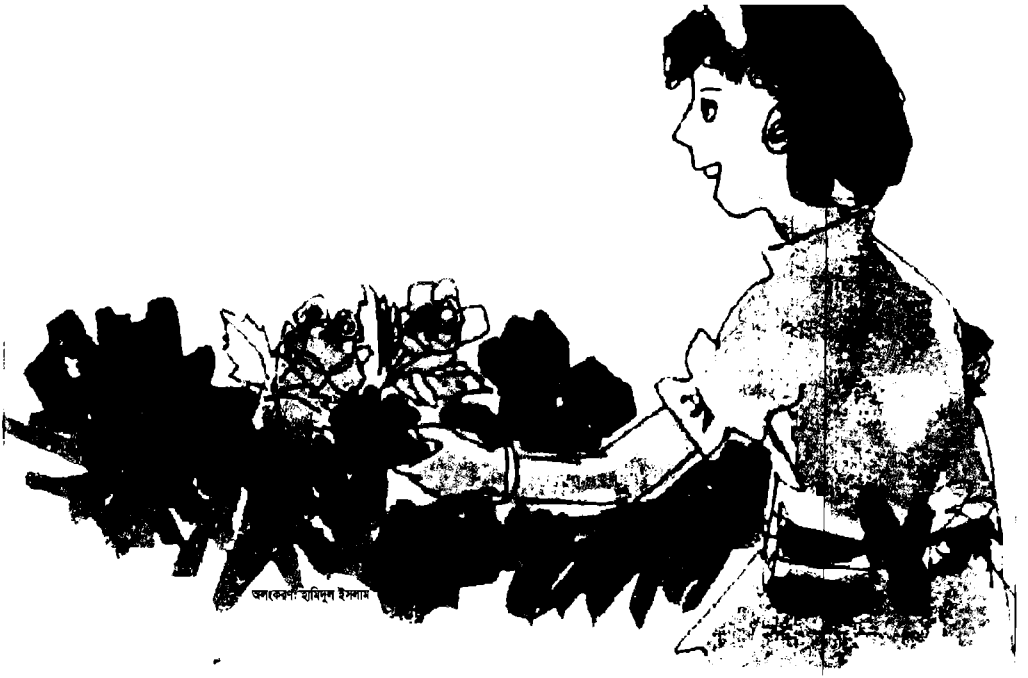

একটি সুন্দর স্বপ্ন

ছোট মেয়ে মীম। সারাদিন ওর মুখে কথার খই ফোটে। মুখ বন্ধ করতেই চায় না। ওকে নিয়ে বাইরে বের হলে তো কথাই নেই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করবে। এটা কি? ওটা কি? ওটা দেখতে লাল কেন? এটা কেন সাদা? মীমের মা ধৈর্য ধরে একটার পর একটা প্রশ্নের উত্তর দেন। মনে মনে হাসেন। ভাবেন পৃথিবীটাকে চিনে নিচ্ছে, তার ছোট মীম। এভাবে নিজেকে চিনবে। চিনবে বিশ্ব জাহানের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালাকে।

আজ শুক্রবার। ছুটির দিন। কিন্তু মীমের মায়ের ছুটি নেই। বুয়াদের ওপর ভরসা করে বসে থাকলে বাড়িটা মানুষ বসবাসের মত আর থাকে না। তাই সপ্তাহে একদিন তিনি নিজেই বাড়ির কাজে হাত লাগান। বাড়িঘর পরিষ্কার করেন। মীমের জন্য মজার মজার খাবার রান্না করেন। দুপুরে খাওয়ার পর মীমকে নিয়ে ওর মা বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নিচ্ছেন। কিন্তু ওর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। মাকে বলে, আম্মু চল না বাগানে যাই।

www.pathagar.com

মা বলেন : এখন বিশ্রাম নাও। বিকেলে তোমাকে বাগানে নিয়ে যাব।

মীম জেদ করে : না এখনই যাব। মা বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকায়। এ চাহনির অর্থ মীম বুঝতে পারে। সে চোখ বন্ধ করে পাশ ফিরে শুয়ে থাকে। কিছুক্ষণ পর মীম ওর কপালে মায়ের হাতের ছোঁয়া টের পায়। ওর এটা একটা অসাধারণ ক্ষমতা। অন্য সবার হাতের ছোঁয়া থেকে সে মায়ের ছোঁয়াকে আলাদা করতে পারে। হয়তো অন্য শিশুরাও পারে। তা তো আর মীম জানে না। তাই তার কাছে ব্যাপারটি অসাধারণই মনে হয়। সে আস্তে আস্তে চোখ খুলে। তাকিয়ে দেখে শিয়রে দাঁড়িয়ে মা হাসছেন।

: ওঠ। বাগানে যাবে না.... মার কথা শেষ হওয়ার আগেই উঠে পড়ে, মীম। মায়ের সাথে বাগানে যায়। মীমের প্রিয় ফুল গোলাপ। সে এক দৌড়ে গোলাপ ফুল গাছগুলোর কাছে চলে যায়। অনেকগুলো গোলাপ ফুটে আছে। মীম গুণতে শিখেছে। সে গুণে দেখে এক, দুই, তিন, চার .....দশ। সে ফিক করে হেসে বলে : বা! দশটি গোলাপ। কী সুন্দর গোপালগুলো। সে পাঁপড়িগুলোর ওপর হাত বুলায়। তার খুব ইচ্ছে করে একটা গোলাপ ছিঁড়তে। কিন্তু না । সে ছিঁড়ে না। ফুল ছিঁড়লে বাগানটাকে আর এমন সুন্দর দেখা যাবে না। সে আবার বলে ওঠে : কী সুন্দর গোলাপ। মীমের কথা শুনে ফুলগুলো বলে, তুমিও খুব সুন্দর মীম।

মীম বলে : সত্যি।

গোলাপরা এক সাথে বলে ওঠে : সত্যি সত্যি সত্যি। দশটি ফুলের মাঝখানে ফোটা বড় গোলাপটি বলে : তোমরা একটু থাম। আমি মীমের সাথে একটু কথা বলি।

সবাই চুপ করে। বড় গোলাপটি বলে : মীম তুমি আসলেই সুন্দর। শিশু আর ফুলেরা নিষ্পাপ তো তাই তারা এত সুন্দর।

মীম প্রশ্ন করে : নিষ্পাপ মানে কি?

গোলাপ বলে : আমাদের সবার সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহতায়ালা। তাঁর নির্দেশ যারা মেনে চলে তারাই হলো নিষ্পাপ। তুমি অবশ্যই খেয়াল করেছ, মানুষ ছাড়া আর কারও তার নির্দেশ অমান্য করার সাধ্য নেই। যেমন ধর আমরা এখানে ফোটে আছি। আল্লাহর নির্দেশ মত সুবাস ছড়াচ্ছি। মানুষকে আনন্দ দিচ্ছি। একদিন আল্লাহর নির্দেশে ঝরে পড়ে যাব।

মীম প্রশ্ন করে : কিন্তু আমরা। গোলাপ গম্ভীর গলায় বলে : তুমি নিজে নিজে

www.pathagar.com

চলতে পার। খেতে পার। হাঁটতে পার। আস্তে আস্তে পড়তে শিখবে। বাড়ির বাইরে যাবে। অনেক অনেক কিছু শিখবে। অনেক মানুষের সাথে আলাপ পরিচয় হবে। যতই বড় হবে তোমার পৃথিবীটাও তত বড় হবে।

মীম বলে : অবশ্যই বড় হবো। অনেক বড় হবো। বড় হয়ে আমি ডাক্তার হবো।

মীমের কথা শুনে সবগুলো গোলাপ এক সাথে বলে উঠে : আমরাও চাই তুমি অনেক বড় হও।

বড় গোলাপটি বলে : আমিও চাই। কিন্তু শুধু চাইলেই তো হওয়া যায় না। তোমাকে আল্লাহতায়ালার নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

মীম প্রশ্ন করে : আল্লাহর নির্দেশ কিভাবে জানতে পারবো?

গোলাপের মুখে হাসি ফোটে। সে বলে : আল্লাহতায়ালা যুগে যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন, মানুষকে তাঁর নির্দেশ শিখানোর জন্য। আর সর্বশেষ নবী ও রাসূল হলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর মাধ্যমে তিনি পাঠিয়েছেন মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এ মহাগ্রন্থেই লেখা আছে তাঁর আদেশ নিষেধ। মানুষ কিভাবে চলবে, কোরআনের নির্দেশ কিভাবে মানতে হবে, তা নিজে করে দেখিয়েছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তাঁর কথা ও কাজকে বলা হয় হাদীস। তাঁর সারা জীবনের কাহিনীও লেখা আছে বিভিন্ন বইয়ে। ঐসব বইকে বলে সিরাতুন্নবী (সা.) বা নবীর জীবনী।

মীমের চোখে মুখে খুশির ঝিলিক খেলে যায়। সে বড় গোলাপকে বলে : তা হলে তো সুন্দর হওয়া খুব সহজ। আমি কোরআন, হাদীস, আর সিরাতুন্নবী (সা.) পড়বো এবং সেইভাবে চলবো।

দশটি গোলাপ সুর করে বলে উঠে : তা হলে তোমার জীবন সুন্দর হবে আমাদের চেয়ে আরও আরও....।

: মীম মীম ওঠো ওঠো। মায়ের ডাকে মীমের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে চোখ খুলে। তার ঘুমের ঘোর কেটে যায়। কিন্তু স্বপ্নের ঘোর কাটে না। পাশের রুমে সিডি প্লেয়ার বাজছে। ভেসে আসছে মিষ্টি সুরের গান..... গোলাপের বাগানের কাছ দিয়ে যেতে একটি গোলাপ বললো আমায়.....।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

নাম : মো. হারুন অর রশীদ

লেখক নাম : হারুন ইবনে শাহাদাত

পিতার নাম : মো. শাহাদাত হোসেন

মাতার নাম : হাসনা বেগম

জন্ম : ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১। টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার সূতী হিজুলিপাড়া গ্রামে (নানা বাড়ীতে)।

পৈতৃক নিবাস : নবগ্রাম, গোপালপুর, টাঙ্গাইল।

লেখাপড়া : বিএসএস (সম্মান), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পেশা : সাংবাদিকতা।

প্রকাশিত গ্রন্থ : (১) জ্বলছে চেচনিয়া, (২) তারপরও ভালবাসি, (৩) ঘরে বসে বহুদূর ও (৪) নাফিস ও লিন্ডার গল্প ।

সম্পাদনা : (১) স্মৃতি, (২) ঐতিহ্য, (৩) আদর্শ পরিবার গড়ার শত টিপস ও (৪) জেরুসালেম মুসলিম বিশ্বের সমস্যা।

স্থায়ী সদস্য : জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সদস্য : বাংলা একাডেমী, সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকা, বাংলাদেশ।

বিবাহিত : স্ত্রী- হাফিজা তাহিরা হ্যাপী।
সন্তান : এক মেয়ে- হাসানাত ফারিহা নূন।

www.pathagar.com

BCBS
Estd-1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬০৭৫২৩।

ঢাকা অফিস ঃ ১২৫, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১।

www.pathagar.com